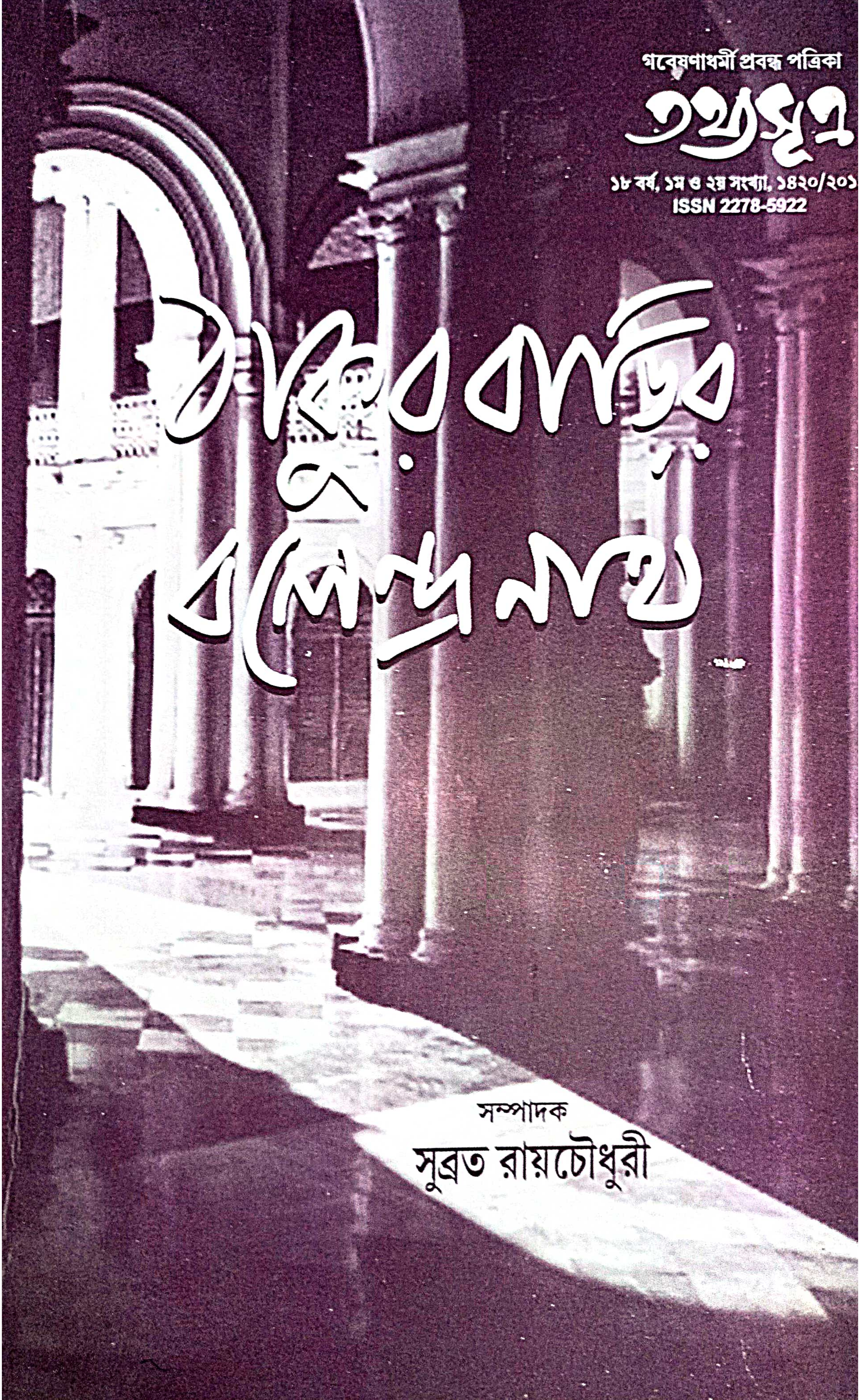

গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকা

তথ্যসূত্র

১৮ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, ১৪২০/২০১

ISSN 2278-5922

ঠাকুরবাড়ির বলেন্দ্রনাথ

সম্পাদক

সুব্রত রায়চৌধুরী

মোহিনীমোহন সরদার

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ৬ নভেম্বর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। পিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতা—বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, খুল্লতাত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন তিনি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি এক নতুন আদর্শের স্থপয়িতা। কবিত্বময় গদ্যে তিনি সাহিত্য ও ললিতকলা বিষয়ক সমালোচনা গ্রন্থ 'চিত্র ও কাব্য'[২] রচনা করেছিলেন। 'মাধবিকা'[৩] ও 'শ্রাবণী'[৪] তাঁর দু-খানি কাব্যগ্রন্থ। 'বালক',[৫] 'ভারতী ও বালক'[৬], 'ভারতী'[৭], 'সাধনা',[৮] 'সাহিত্য'[৯], 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'[১০] 'পুণ্য'[১১] 'প্রদীপ'[১২] প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনামূলক বহু প্রবন্ধ, কবিতা, চিত্র বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন তিনি। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাতেও তাঁর দক্ষতা সর্বজন বিদিত। স্বদেশী বস্ত্রের ব্যবসায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁর জীবনের একটি বড় স্বপ্ন ছিল আর্য-সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের মিলন; জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সেই চেষ্টাই করেছিলেন। অপরিণত বয়সে প্রয়াত[১৩] এই সাহিত্যিক কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন না, সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি খুল্লতাতের যথার্থ উত্তরসূরীও ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনায় কম-বেশি রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল। স্নেহভাজন বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখাই পরিমার্জনা করে দিতেন কবি। মূলতঃ 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি। এই প্রবন্ধগুলি থেকে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচক বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য

সমালোচনার রীতি ও প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত[১৩] প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বলেন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য'। মাত্র ১৯ বছর বয়সে লেখা এই প্রবন্ধটি অদ্যাবধি প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন স্বরূপ। প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের বক্তব্যগুলি এইরূপ ঃ

১. 'বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য ইংরেজী প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ধর্ত্তব্য'।

২. 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আর কিছুই নহে, কেবল কবিতা'।

৩. 'আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আদিরসের আধার'।

৪. 'প্রাচীন সাহিত্যে বীররস মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচু করিয়াছে বটে, কিন্তু জমাইতে পারে নাই।' ... বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররস অনেক সময় কোমল রসে ভিজান অথবা একেবারেই রসসম্পর্কশূন্য'।

৫. 'বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে, মৈথিলী, হিন্দী হইতে তাহার জন্ম'।

৬. 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—ভাবের সাহিত্য এবং পাণ্ডিত্যের সাহিত্য'।

৭. 'প্রাচীন সাহিত্যকে কিছুতেই ধর্ম্মসাহিত্য বলা চলে না'।

৮. 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ গীতিকাব্যে'।

৯. 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উপরে জয়দেবের কিছু বিশেষ প্রভাব অনুভব হয়। জয়দেব বাঙ্গালা সাহিত্যের কবি নহেন বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। ... জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি না হৌন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবের প্রথম কবি বটে'।

বলেন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুটি মূল্যবান সম্পদ 'চর্যাগীতিকোষবৃত্তি' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' তখনো আবিষ্কৃত হয়নি; তখনকার দিনে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কবি হিসাবে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রমুখ ব্যক্তি বিশেষ আলোচ্য ছিলেন। প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্রনাথ মুখ্যত এঁদেরই আলোচনা করেছেন। তবে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের কালপর্ব নিয়ে অদ্যাবধি যে বিতর্ক আছে সে সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের স্পষ্ট বক্তব্য[১৪] আজো আমরা স্বীকার করি। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের একমাত্র লিখিত Form ছিল কবিতা। গদ্যের প্রচলন যে একেবারেই ছিল না এমন নয়, সাধারণ কথাবার্তা, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গদ্যের প্রচলন ছিল; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রচনাই কবিতার ঢঙে লেখা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে কবিতা আবার গীতিকাব্য। সুর, তাল লয় যোগে গেয় কবিতা। এ বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের স্পষ্ট বক্তব্য,

'গীতিকাব্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ, গীতিকাব্যেই তাহার শ্রীবৃদ্ধি।'[১৬]

বাংলা সাহিত্যের আদিরস প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের বক্তব্যটিও সুচিন্তিত। তাঁর মতে এর মধ্যে কবি অপেক্ষা সেকালের সমাজ ব্যবস্থাই অধিকতর দায়ী। সেকালের সমাজের অবস্থা এতটাই হীন হয়ে পড়েছিলো যে, অশ্লীলতা বই আর কিছুতেই পাঠকের মন উঠত না। যে কারণে দেবতাকে বানর, শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি ইদানীং লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকা সেবকের অস্থিপঞ্জর হয়ে উঠেছে; কৈলাসধাম হয়েছে গঞ্জিকা সেবনের প্রধান আড্ডা। রাজনীতিবিশারদ, অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন ছলনাপটু, বংশীধর, রমণীমোহন। বলেন্দ্রনাথের মতে—এই জাতীয় 'ছিবলামির' জন্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বীররস দানা বাঁধতে পারে নি। কারণ, আদিরস যেরূপ বাঙালির প্রাণের রস, বীররস তদনুরূপ না হওয়ায় আদিরসের কাছে তার পরাজয় ঘটেছে।

সমগ্র প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বলেন্দ্রনাথ ভাবের সাহিত্য ও পাণ্ডিত্যের সাহিত্য এই দুই ভাগে ভাগ করতে চান। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি আদি কবিরা প্রথম ভাগের কবি ছিলেন। কারণ, তাঁদের সাহিত্যে অক্ষরের প্রাধান্য অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্যই বেশি; আর তৎপরবর্তী সাহিত্যিকদের কাব্যে ভাবুকতাহীন অক্ষর শাসনের প্রভাব বেশি থাকায় সেখানে ভাবের স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ধর্মনিভর সাহিত্য বলে যে মত অদ্যাবধি প্রচারিত এবং প্রচলিত; বলেন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করে জানালেন—

> প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষ রূপে সংযুক্ত কতকগুলি পুঁথি আছে স্বীকার্য কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যগ্রন্থ মাত্রেই যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষ কোনও সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহা বোধ হয় না।[১৭]

তাঁর মতে গণেশ, সরস্বতী প্রমুখ দেব-দেবীর বন্দনা সেকালের ফেসান ছিলো। কিন্তু কেবলমাত্র বন্দনাটুকুর জোরে কবি বিশেষকে ধর্মপ্রাণ অথবা সবন্দনা কাব্যগ্রন্থগুলিকে ধর্মগ্রন্থ বলে চিহ্নিত করা যায় না। ভারতচন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থে শিব কর্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস বর্ণনা করেছেন, বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করেছেন। অতএব তাঁদের গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম এইরূপ তিনি মনে করেন না।

সংস্কৃত ভাষার শেষ বাঙালি কবি জয়দেবকে বলেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি। কারণ, তাঁর মতে—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উপর জয়দেবের কিছু বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা এক হিসাবে তাঁরই শিষ্য। তাছাড়া গোবিন্দদাস এবং তৎপরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের উপর জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই বলেন্দ্রনাথের বক্তব্য 'জয়দেব বাংলা ভাষার আদি কবি না হৌন, বাংলা সাহিত্যের ভাবের প্রথম কবি।'

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যগুলি আজো আমরা স্বীকার করি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-এ প্রকাশিত তাঁর

এই সুচিন্তিত যুক্তিপূর্ণ সংহত অথচ সুদৃঢ় বক্তব্যগুলি থেকেই তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয়টিও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধটির শিরোনাম 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস'[১৮]। প্রবন্ধটিতে বলেন্দ্রনাথ স্পষ্টতই স্বীকার করলেন—'বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস'।[১৯] দুইজন কবি সমসাময়িক এবং একই বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করলেও বিদ্যাপতি নিজের হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে রাধা-কৃষ্ণকে দেখেছেন, নিজের রুচি অনুযায়ী রাধা-কৃষ্ণকে এঁকেছেন আর চণ্ডীদাস আত্মভাব দিয়ে তাঁর রাধাকে প্রেমিকা করেছেন। কেবল ভাবে নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও এই দুই কবির বিস্তর ব্যবধান তাঁদের রচনাকে পৃথক করে তুলেছে। বলেন্দ্রনাথের বক্তব্য

> বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। ... প্রেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, তাহা তিনি জানেন। ... চণ্ডীদাসের কথার ধরনে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে বিদ্যাপতিতে তাহা নাই।[২০]

চণ্ডীদাস প্রেমের জ্বালা বেশ বোঝেন; তিনি মূলতঃ দুঃখের কবি। চণ্ডীদাস যে তাঁর লেখায় অনবরত দুঃখের কথা বলেছেন এমন নয়, তবে তাঁর রচনায় হয়তো অজ্ঞাতসারে কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করেছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন এবং হৃদয় দুইই যে দুঃখভাবসিক্ত ছিলো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপরদিকে বলেন্দ্রনাথের মতে

> বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাহ্য সৌন্দর্য্য বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন—অধরের রাঙিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্রগমন।[২১]

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও বিদ্যাপতির কৃষ্ণের মতো রাধার বাহ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ; কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা তিনি রাধাকে দেখেছেন ভালো করে। বিদ্যাপতির রাধা 'ফিকির কৌশলে' অধিক দক্ষ। কিন্তু তাঁর রাধার আকুলতা চণ্ডীদাসের রাধার মতো নয়।

দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস অনেক উচ্চদরের কবি। কারণ, চণ্ডীদাসে ভাবের কি স্বাভাবিক স্ফূর্তি; হৃদয়ের কি স্বতঃউচ্ছ্বাস। কেবলমাত্র বিরহের স্থানে বিদ্যাপতির কবিতাগুলি বড়ই ভাবময়। তাঁর মতে—

> বিদ্যাপতির বিরহ গানগুলিতে কেমন একটা ভাব আছে। 'তাঁহার এ ভরা বাদর' শুনিলে বর্ষাকালের বিরহের ভাব কেমন যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার 'সময় বসন্ত কান্ত রহ দূরদেশ' শুনিলে বসন্তের বিরহও তেমনি ফুটিয়া উঠে।[২২]

'যৌবনাচ্ছন্ন' কবি বিদ্যাপতির রাধার মধ্যে কেমন একটি অতৃপ্তির ভাব আছে। বিদ্যাপতি পণ্ডিত কবি, তাঁর লেখায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া স্পষ্ট, আর চণ্ডীদাস সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত নাট্যরসাস্বাদযুক্ত কবি। চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়শই কিছু ছুটস্ত; বিদ্যাপতির

কিছুটা ধীর। লেখা দেখলেই চণ্ডীদাসকে চেনা যায়;অথচ বিদ্যাপতিকে সহজে ধরা যায় না। দীর্ঘ এই আলোচনা থেকে চৈতন্যপূর্ববর্তী এই দুই বিখ্যাত বৈষ্ণব কবির কবি স্বভাবটি আমাদের কাছে একেবারে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক ছিলেন তাঁর 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' প্রবন্ধটির সমালোচনায় সেকথা পুনর্বার প্রমাণিত হয়।

১২৯৬ বঙ্গাব্দের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়[২৩] প্রাগাধুনিক সাহিত্য বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের তৃতীয় প্রবন্ধ 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটিতে মুকুন্দরাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটিকেই বলেন্দ্রনাথ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের 'বাঙ্গালী কবি নয়'[২৪] প্রবন্ধের বক্তব্যটিই পল্লবিত হতে দেখা গেছে বলেন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধে। তাঁর মতে

> মুকুন্দরামে ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্য্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না। বস্তুর অতীত প্রদেশে তাহার তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না— চর্মচক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপ বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার তাহার ক্ষমতা আছে। আর থোড় বড়ি মোচার ঘন্টে তাঁহার অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হাটে যাইলে তিনি হাট শুদ্ধ জিনিষের দর জানিয়া আসেন, ঘরে আসিয়া পাকশালায় গিয়া পাচককে রন্ধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, সংসারের কাজকর্ম্মে অনেক গৃহিনী তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।[২৫]

কালীপ্রসন্ন ঘোষের নীরব কবি'র[২৬] তত্ত্ব এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালীর কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালী কবি'[২৭] এই দুই মত বাতিল করে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি ও বাংলা কবিতার দুর্বলতা প্রসঙ্গে আলোচনাকালে উদাহরণ হিসাবে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন।[২৮] স্বভাবতই সেই সমালোচনা মুকুন্দের বিপক্ষের আলোচনা ছিলো। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ বিরূপ সমালোচনা পড়ে মুকুন্দ ভক্তরা এবং বিশেষ করে বঙ্কিম গোষ্ঠীর সমালোচকেরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেছিলেন। এই মসীযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যাঁরা ছিলেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য প্রবন্ধে তাই মুকুন্দ সম্পর্কে খুল্লতাতের মতটিকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। বলেন্দ্রনাথ লিখছেন,

> মুকুন্দরাম হৃদয়ের সুগভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারও বিরহ বেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক।[২৯]

বলেন্দ্রনাথের মতে—কাব্যের যে আসল প্রাণ, সুগভীর ভাবব্যঞ্জনা, রসের উদ্রেক করা মুকুন্দের কাব্যে তা পাওয়া যায় না। তাঁর মতে মুকুন্দ আসলে 'শরীরের কবি'। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন,

স্বভাবের সৌন্দর্য, কিম্বা হৃদয়ের গভীর ভাব বর্ণনা করিতে মুকুন্দরাম আদবেই পারেন না। তিনি কাঠমো গড়িতে পারেন, কিন্তু কাঠামোয় প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন না। সাধারণ ভাব কথাবার্ত্তা যেমন, তেমনি তিনি বেশ বর্ণনা করেন বটে।[৩০]

বলেন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি পাঠ করলেই বোঝা যায় তিনি কিছুটা ইচ্ছাকৃত একপ্রকার জোর করেই মুকুন্দের বিরুদ্ধ সমালোচনায় নেমেছেন। যদিও নিজের অজান্তেই তিনি দোষ দেখাতে গিয়ে মুকুন্দের গুণগুলিই তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে কবিকঙ্কণের লেখায় কেমন একটি ধর্মের সুর আছে। সাধারণ চরিত্র-চিত্রণে তাঁর ক্ষমতা অধিক। কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি চরিত্র বেশ স্বাভাবিক। ধনপতি সদাগর, লহনা, খুল্লনা, দুর্বলা প্রভৃতি চরিত্রও অস্বাভাবিক হয়নি। তবে ফুল্লরার বারমাস্যার মধ্যে কবিত্বের অভাব দেখে বলেন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন,

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখে কবিত্ব কোথাও ত দেখা যায় না। ফুল্লরার দুঃখ যদি কবিত্ব রসসিক্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ারে দুয়ারে দুইবেলা যে সকল অভাগিনীরা একমুষ্টি অন্নের জন্য কাঁদিয়া বেড়ায় তাহাদের কথাই বা কবিত্ব নহে কেন?[৩১]

আসলে 'নবজীবন' পত্রিকায় 'কাব্যিক সমালোচনা' প্রবন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ফুল্লরার বারমাস্যার প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

কবিকঙ্কণের দারিদ্র দুঃখ বর্ণনা — যে কখন দুঃখের মুখ দেখে নাই, তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান!
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।

দুবেলা-দুসন্ধ্যা অন্ন জুটে না— কোনদিন ভাত খাই, কোনদিন বা আমানি খাইয়া কাটাই। খাবার তো কোন পাত্র নাই; ভাত পাতে খাওয়া যায়, আমানি তো পাতে খাওয়া যায় না। হাঁড়িতেও খাইতে নাই, মেঝেয় গর্ত্ত করিয়া করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতেই ঢালিয়া আমানি খাই।

যে আমানি খাইয়া মধ্যে মধ্যে দিন কাটায়, সে অত কথা বলিবে কেন? সে বলিল আমাদের দুঃখ বুঝিবে তো ঐ আমানি 'খাবার গর্ত্ত' দেখ।

"দারিদ্র্যের কি কঠোর অভিব্যক্তি! কথা কয়টা বুকের ভিতর বসিয়া যায়। ভাঙ্গা ঘরের গর্ত্তকয়টা বিলাসীগণের জটে ধরিয়া, তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে। আবার বলি ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা সার্থক প্রতিভা।"[৩৩]

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এই যুক্তি রবীন্দ্রনাথ সেদিন মানতে পারেন নি। এর প্রত্যুত্তরে 'ভারতী ও বালক'[৩৪] পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাব্য ঃ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধে তিনি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিরোধিতা করে লিখলেন—

...আমানি খাবার গর্ত্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্য নৈপুণ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে

সিক্ত হইয়া উঠে নাই, ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহা যদি সার্থক কবিত্ব' হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাঁটে; সে তো আরো কবিত্ব।[৩৫]

স্পষ্ট ও বস্তুগত কবিতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এবং মূলতঃ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেদিন মুকুন্দের যে বিরোধিতা করেছিলেন, তারই পৃথকরূপ প্রকাশিত হয়েছে বলেন্দ্রনাথের আলোচ্য প্রবন্ধে। ফলে প্রবন্ধটিতে বারে বারে বলেন্দ্রনাথ মুকুন্দের বিরূপ সমালোচনা করে খুল্লতাতের পক্ষে সওয়াল করেছেন। মুকুন্দের বাস্তবজ্ঞান, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাঁর চরিত্রসৃষ্টির রহস্যকে আবিষ্কার না করে বলেন্দ্রনাথ কবির অক্ষমতার দিকগুলিকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন; আধুনিক সমালোচকেরা যেখানে মুকুন্দ কবির এই বিশেষ গুণগুলি বিচার করে তাঁকে 'কথাশিল্পীর', 'বাস্তববাদী কবির', 'জীবনরসরসিক'-এর মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, সেখানে মুকুন্দের সীমাবদ্ধতাকে বড় করে সমালোচনা করে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের অজান্তেই রবীন্দ্রানুসরণকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন।

'ভারতী ও বালক'[৩৬] পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বলেন্দ্রনাথের চতুর্থ প্রবন্ধ কৃত্তিবাস ও কাশীদাস'। এই প্রবন্ধটিতেও বলেন্দ্রনাথ খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তাঁর মতে—

> কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী কোন গ্রন্থেই জুটে নাই। বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই হৃদয়ে রামায়ণের কাহিনী মুদ্রিত আছে, ...ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত স্বর্ণসিংহাসনের পার্শ্বে দেখ, একখণ্ড কৃত্তিবাসের পুথি আছে; মধ্যবিত্তের বৈঠকখানার কোণে রামায়ণ একখানা থাকা চাই; এমন কি, সামান্য দোকানদারের চাল ডালের হাঁড়ির মধ্যে হইতেও রামায়ণ উঁকি মারে।[৩৭]

রামায়ণের এই সর্ব্বব্যাপী প্রভাব আসলে কবি কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তারই বড় প্রমাণ। বলেন্দ্রনাথের মতে—কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকি গ্রন্থের অনুবাদ নয়, তা কৃত্তিবাসের নিজস্ব মস্তিষ্ক প্রসূত। তাঁর মতে—কথকথা থেকেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংগৃহীত। এই কারণে এই বঙ্গীয় কবি বাল্মীকি থেকে ভিন্ন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অতঃপর বলেন্দ্রনাথ বেশ কিছু যুক্তি জাল বিস্তার করে কৃত্তিবাসের স্বকীয়তার পক্ষে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে— 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুদ্ধ বাঙ্গালা দেশের, তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীত্বই যথেষ্ট'।

প্রাবন্ধিকের মতে—'কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুকুন্দরামের সমকালীন কবি। বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্ণ পৌরাণিক প্রভাব মুকুন্দরাম কৃত্তিবাস হইতেই একরূপ আরম্ভ বলা যায়।'। কৃত্তিবাসের ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল তাতে 'যাবনীমিশাল' ভাষার প্রভাব নেই বললেই চলে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল রামায়ণের অনুরূপ হলেও সহজভাবে, সহজ ভাষায় দেশের সাধারণের কাছে বাল্মীকির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই

কৃত্তিবাসের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বলেই তাঁর অভিমত। তাঁর কথায়—'কৃত্তিবাস সে কালের হিসাবে একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন।

কৃত্তিবাসের পরে বঙ্গীয় মহাকাব্যের মুখরক্ষা করেছেন কাশীরাম দাস। বাল্মীকি রামায়ণের অনেক পরে ব্যাস মহাভারত রচনা করেছিলেন বলে বলেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ঃ

> মহাভারতের কাল যে রামায়ণের অনেক পরে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বাল্মীকির রচনা ব্যাসের রচনাপেক্ষা সরল। তাহার পর মহাভারতের সময়ে যেরূপ জটিল রাজনীতি, লেখাপড়ার চেষ্টা, রামায়ণের সময়ে সেরূপ কিছুই নাই। ... রামায়ণের কৃষ্ণের মত নীতিবিদই বা কোথায়? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত ব্যূহ রচনাদক্ষ সেনাপতিকুলই বা কোথায়?[৩৮]

তবে রামায়ণে যা যা প্রকাশিত হয়েছে অর্থাৎ—ধর্মনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, পরিবার নীতি, অর্থনীতি—এ সবই আছে মহাভারতে। তাই বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত—'রামায়ণ, মহাভারত হইতে আমরা মানব চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করি।

'ভারতী ও বালক'[৩৯] পত্রিকায় প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রবন্ধ যথাক্রমে 'বঙ্গসাহিত্য ঃ রামপ্রসাদের গান' ও 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর'। প্রবন্ধ দুটিতে রামপ্রসাদ সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথের বক্তব্যগুলি এইরূপ—

১. সাধক এবং ভক্তি সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে রামপ্রসাদ জনপ্রিয়। রামপ্রসাদী সুর তাঁর প্রধান কীর্তি। বিদ্যাসুন্দরই তাঁর কবিরঞ্জন উপাধির মূল কারণ।
২. সরল ভাবে, সোজা কথায় হৃদয়ের সুরে তিনি মাকে নিজের সুখ-দুঃখ জানিয়েছেন, মায়ের উপর কখনো অভিমান করেছেন, কখনো তাঁর চিরপ্রসারিত বক্ষে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছেন, মাতৃস্নেহে পূর্ণ হৃদয় হয়ে মরণের বিভীষিকাকে অনায়াসে উপেক্ষা করেছেন।
৩. রামপ্রসাদ সেনের প্রধান গুণ এই যে, তাঁর রচনায় কাপট্য নেই। ভাব বন্ধক দিয়ে, হৃদয় বিক্রি করে সঙ্গীতের মধ্যে আভিধানিক জ্ঞান এবং দুরূহগুণখ্যাত তালাভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার চেষ্টা রামপ্রসাদে দেখা যায় না। নিজের প্রাণের গানগুলিকে তিনি প্রাণের সুরে বসিয়েছেন। ভাবের মতো সুরও তাঁর হৃদয় থেকে স্বতঃ উৎসারিত।
৪. রামপ্রসাদের গানের আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় তাদের ছন্দ। তাঁর ছন্দ অবশ্য একেবারে নূতন ধরনের নয়, নূতনত্ব তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় অক্ষর গণনার উপর যাঁরা একান্ত নির্ভর করেন রামপ্রসাদী গানের ছন্দ আলোচনা করে দেখলে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে স্বরান্ত এবং হসন্ত উচ্চারণের উপর ছন্দ অনেক সময় যথেষ্ট নির্ভর করে।
৫. রামপ্রসাদ বাহ্য অনুষ্ঠান প্রিয় ছিলেন না। তিনি বলিপ্রথার বিরোধীও ছিলেন।

তিনি কালীর উপাসক ছিলেন সন্দেহ নেই কিন্তু কালী উপাসক বললে বঙ্গ দেশে সাধারণতঃ যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। তাঁর কালীও স্বতন্ত্র, পূজাপদ্ধতিও বিভিন্ন। তিনি অকপট ছিলেন। প্রেমময়ীর চরণে তাঁর অটল নির্ভর ছিল। এইজন্যই কেবল সাহস করে তিনি অনেক কথা বলতে পেরেছেন।

৬. নির্বাণ সম্বন্ধে রামপ্রসাদের মত বর্তমানকালের অনেক একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে মেলে। আত্মার নির্বাণ অথবা ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তি তিনি বিশ্বাস করতেন না। মায়ের পদপ্রান্তে বসে চিরদিন সেই বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করতে পারলেই রামপ্রসাদ তৃপ্তি পেতেন।

৭. রামপ্রসাদের গান যথার্থ নিঃস্বার্থ ভক্তির পরিচয়। বাংলার কীট পতঙ্গ অবধি তা জানে।

৮. রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের মতোই আদিরসের কাব্য। তাতে চঞ্চলচিত্ততা আছে, রূপতৃষ্ণা আছে, হীরা মালিনী আছে, গুপ্ত প্রণয় আছে— সে প্রণয় আবার সম্পূর্ণ রূপজ; সুড়ঙ্গ, সখী, চোর, কোটাল— সবই আছে। নানা ভাষার কথায় বিবিধ ছন্দে বিস্তর অনুপ্রাস দিয়ে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা রচনা করেছেন। ভারতচন্দ্র অপেক্ষা তাঁর ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হয়েছে মাত্র।

৯. বিদ্যার জীবন সহচরীবৃন্দের উপহাস রসিকতার মধ্যেই গঠিত। ভোগবিলাসেই তার জীবনের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং স্বভাবতই সে বিলাসিনী। সদ্‌দৃষ্টান্ত ও রীতিমত ধর্মশিক্ষার তার যথেষ্ট অভাব ছিল। আত্মসংযম এই কারণে তারপক্ষে অসম্ভব।

১০. রামপ্রসাদের সুন্দর অনেকটা স্ত্রী প্রকৃতির লোক। সুন্দর মালা গাঁথতে, মালিনী মাসীর সঙ্গে গল্প করতে আর বিদ্যার হাতে কলের পুতুলের মতো সারাক্ষণ নাচতে পারে। পুরুষোচিত দৃঢ়তা সুন্দরের নেই। স্ত্রী জাতির মতো বেশবিন্যাস করতে সুন্দর অত্যন্ত পটু। অত্যন্ত দক্ষতায় এবং নিপুণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে, সহজ সরল ভাষায় বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধদুটিতে রামপ্রসাদী গান ও তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যের যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তা আজো আমাদের কৌতূহলকে উদ্দীপিত করে।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সপ্তম প্রবন্ধটি 'ভারতচন্দ্র রায়' শিরোনামে 'ভারতী ও বালক'[৪০] পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ এই প্রবন্ধটিতে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের শেষতম কবি ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। তাঁর মতে — 'ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের শেষ কবি'। কারণ তাঁর পরে অনেক কবি বাংলা সাহিত্য রচনা করলেও

খ্যাতি লাভের মূলে যে ক্ষমতার দরকার হয়, তা তাঁদের ছিল না। সুতরাং ভারতচন্দ্রকে ছাড়িয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতচন্দ্র রায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন এবং সে সময়ের বঙ্গদেশে তিনি রাজসভাকবিও ছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,

> ভারতচন্দ্রের ছন্দের পারিপাট্য পরিহাস—রসিকতা, গল্প সাজাইবার ক্ষমতা, এই সকলে সহজে মন আকৃষ্ট হয়। এমনকি, সাজসজ্জার প্রভাবে সময় সময় দোষগুলিকে সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক করা দায় হইয়া উঠে। বাস্তবিক, কথার কারিগরিতে ভারতচন্দ্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারে কয়জন।[৪১]

গল্পের কথা এবং সেই কথা সাজাবার নিপুণ ক্ষমতা ছিল ভারতচন্দ্রের। অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে এবং দক্ষতায় তিনি দেহতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব;বাঙালি পরিবারের সংসারতত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্লেষ অলংকার, কথার চাতুরী এবং রঙ্গরস প্রকাশে তার দক্ষতা অসামান্য। তাঁর কাব্য প্রকরণে, ভাবে, ভাষায়, কাহিনি ও চরিত্র নির্মাণে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব স্পষ্ট। বলেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন,

> ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের যে মৌলিকতা নাই, এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহার চরিত্র চিত্রণে, রন্ধনাদি বর্ণনে সহজেই কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তোপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, অন্নদামঙ্গলে অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা উপলব্ধি করা যায় কিনা।

এতদসত্ত্বেও ভারতচন্দ্রে যে রঙ্গরসের প্রাধান্য বেশি, অন্নদামঙ্গল কাব্যের অনেক শ্লোক যে বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদ বাক্যের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্নদামঙ্গল কাব্যে যে নাট্যরসের প্রাধান্য বেশি—সে সব কথাও বলেন্দ্রনাথ উল্লেখ করতে ভোলেন নি।

'ভারতী ও বালক'[৪৩] পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের অষ্টম প্রবন্ধটি হলো 'কেতকা—ক্ষেমানন্দ'[৪৪]। বলেন্দ্রনাথের মতে — কেতকা দাস এবং ক্ষেমানন্দ দাস এঁরা পৃথক দুইজন কবি 'মনসার ভাসান' নামে যে কাব্যটি রচনা করেছিলেন, তাতে ভাষা এবং কল্পনা কোনোটিরই জোর ছিল না। তাঁদের বর্ণনা মুকুন্দ চক্রবর্তী, কৃত্তিবাস প্রমুখ কবিদের তুলনায় খুবই হীন ছিল। বলেন্দ্রনাথের স্পষ্ট বক্তব্য :

> মনসার ভাসান রচয়িতারা স্থানে স্থানে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন — শুধু ভাবে নহে, ভাষায় পর্য্যন্ত কবিকঙ্কণের সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়।[৪৫]

এই দুই কবির লেখার ধরন পাকা নয়, তাঁদের উপাখ্যানে কবিত্বরস ও ঘটনাবৈচিত্র্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। বাঁধা উপমা, অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশে তাঁরা কাব্য রচনা করেছেন। বলেন্দ্রনাথের মতে,

> ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে বসেন নাই — লিখিতে হইবে

> বলিয়া দুইজনে ভাগাভাগি কাজ সারিয়াছেন। কেতকা দাস খানিক লিখিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন, ক্ষেমানন্দ লেখনী চালাইয়াছেন; আবার ক্ষেমানন্দ থামিতে কেতকা কলম ধরিয়াছেন। উভয় কবিই নিজ নিজ রচনার শেষে ভণিতায় স্বনাম উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।”[৪৬]

বলেন্দ্রনাথ যখন আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখেন তখন কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য উদ্ধার হয়নি। ফলে দুইরকম ভণিতা দেখে খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেন্দ্রনাথ 'মনসার ভাসান' রচয়িতাদের পৃথক ব্যক্তি[৪৭] বলেছেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি 'কেতকা দাস অর্থে 'মনসার ভক্ত' বোঝানো হয়েছে। কিন্তু কবি প্রকৃত নাম ছিল 'ক্ষেমানন্দ'। অর্থাৎ 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ' একজন ব্যক্তি[৪৮]; যিনি 'মনসার ভাসান' নামে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। ইনি মূলতঃ হুগলী জেলার কবি ছিলেন। 'কেতকা দাস' তাঁর উপাধি ছিল। সে যাইহোক, এই তথ্যটুকু বাদ দিলে বলেন্দ্রনাথের আলোচনাটি মনোজ্ঞ ও বিশ্লেষণাত্মক হয়েছে বলা যায়। বলেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন,

> বেহুলা ভিন্ন মনসার ভাসানে আর চরিত্র নাই। লখীন্দরই বল, চাঁদই বল, আর সনকাই বল, একটি চরিত্রও ভালরূপ ফুটে নাই। বেহুলা কেবল যাহা অল্প বিস্তর দেখা দিয়াছে — তাহাও কেবল এক বিশেষ অবস্থায়। দেবচরিত্রের মধ্যে আছে মনসা— যথেচ্ছাচারিণী, চাটুতৃপ্তা, অসদুপায়ে কার্য্য উদ্ধার দক্ষা।”[৪৯]।

বাস্তববাদী বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বলেন্দ্রনাথ নির্মোহভাবে কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসান কাব্যের সমালোচনা করেছেন। স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন — 'প্রাচীন সাহিত্যেও ভাসান বিশেষ উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে'। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনার সেই প্রথম লগ্নে এমন নির্মোহ, নির্মম, বাস্তববাদী সমালোচক খুব একটা দেখা যায় না।

'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত[৫০] প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবম প্রবন্ধটি হলো 'রাধা'। প্রবন্ধটিতে বৈষ্ণব সাধনার মোক্ষধাম, জীবাত্মারূপী রাধার সামগ্রিক আচার-আচরণ ও রূপের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। বাংলাদেশের সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ একাধিক শ্রেষ্ঠা নারী চরিত্র থাকলেও তাঁরা রাধার মতো 'সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। রাধার চরিত্র, চরিত্র হিসাবে সকল দিক থেকেই হীন; তাঁর মধ্যে পাতিব্রত্যও নেই, সতীত্বের তেজও নেই, শিক্ষা-দীক্ষা-এসবের কিছুই নেই। এতদ্সত্ত্বেও রাধা 'বঙ্গসাহিত্যের জননী, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 'কেন্দ্রস্থল'। এর মূল কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। বলেন্দ্রনাথের মতে,

> আমাদের দেশে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-সঙ্গীতেই মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার অনেকটা বিকাশ হইয়াছে। রমণীর প্রেম আমরা মাতৃভাবে, পত্নীভাবে, কন্যাভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কেবল রমণী ভাবে বড় দেখি নাই। রাধার

চরিত্রে এইভাব কতকটা ফুটিবার অবসর পাইয়াছে। বড় বড় চরিত্রের আদর্শ প্রেমের সহিত কলঙ্কিনী রাধিকার প্রেমের বিস্তর তফাত। সীতা-সাবিত্রীর প্রেম দাম্পত্য প্রণয়ের চরম উৎকর্ষ। রাধার প্রণয় সমাজ-নিয়মের ব্যভিচার। রাধা আদর্শ সহধর্ম্মিণী নহে, গৃহিনীও নহে। মাতৃভাব রাধিকায় বিকশিত হয় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে রমণী হৃদয়ের একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সেইজন্যই বোধহয়, এ দেশের সাহিত্যে রাধার এত প্রভাব।[৫১]

রাধা কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধা; কৃষ্ণের কল্পনা, তাঁর হাসি, বাঁশি বাজানোর দক্ষতা, তাঁর যমুনাতীরে সঞ্চরণ, গোপিণী সঙ্গে বিহার — এসবই রাধাকে মুগ্ধ করে। রাধা কৃষ্ণের দেহে মুগ্ধ, যৌবনে আচ্ছন্ন, ভোগলালসায় অধীর। কেবল রাধার এই আকাঙ্ক্ষাই নয়, রাধার শারীরিক গঠন তৈরিতেও কবিরা গলদঘর্ম হয়েছেন। কবিদের বর্ণনায় রাধার অঙ্গ সৌষ্ঠব পূর্ণ, রূপসী তীব্র গৌরবর্ণা, যৌবন ঢলঢল্; তাঁর মুখে কেমন একটি কোমল ভাব আছে, একপ্রকার সৌন্দর্য আছে যা নিজের মধ্যে স্থির থেকে জগৎকে টেনে আনে। রাধা যেন তেমনই।

দীর্ঘ এই প্রবন্ধটিতে স্তরে স্তরে বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির সৃষ্ট রাধা চরিত্রের রসজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন বলেন্দ্রনাথ। তাঁর মতে—নারীর লজ্জারূপ যে শ্রী তা রাধার নেই, ভোগলালসা তাঁর হাড়ে হাড়ে। তাঁর মানসিক অবস্থা নিতান্তই তেজহীন, অলস, অথচ তাঁর বদন কমলের মতো পেলব ও বিকশিত, নয়ন খঞ্জনের মতো, আর তাঁর ভ্রুভঙ্গে কৃষ্ণের হৃদয় ভাঙে-গড়ে। রাধার এই ব্যক্তি প্রেম আসলে নারীর নারীত্বেরই প্রতিধ্বনি; ‘পলাতকা’ কাব্যের ‘মুক্তি’ কবিতায় প্রকারান্তরে যাকে ব্যক্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ,

> ‘আমি নারী আমি মহীয়সী,
> আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
> আমি নইলে মিথ্যা হ’ত সন্ধ্যাতারা — ওঠা,
> মিথ্যা হ’ত কাননে ফুল — ফোটা।”[৫২]

‘ভারতী ও বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বলেন্দ্রনাথের দশম প্রবন্ধটি হল ‘যশোদা’। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের জননী চরিত্রের পুরোধা এই নারী কৃষ্ণের পালিতা মাতা। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে স্নেহময়ী জননীরূপে যশোদার বিশেষখ্যাতি আছে। বলেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন,

> ‘যশোদা গোপকন্যা[৫৩], গোপপত্নী, কৃষ্ণকে জন্মাবধি আপন পুত্র জানিয়া লালন-পালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতই কৃষ্ণের উপরে তাঁহার মায়া পড়িয়াছে — তিনি কৃষ্ণের জননী। ... যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্ম্মিনীও বটে, কিন্তু ফুটিয়াছেন মাতৃরূপে। স্নেহবৃত্তিই তাঁহার সমধিক বলবতী। কৃষ্ণকে দুইদণ্ড না দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ধেনু চরাইতে যান, যশোদা প্রহর গণিতে থাকেন; কৃষ্ণ খেলিতে

খেলিতে প্রাঙ্গণের বাহির হইলে যশোদা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া দেখিতে আসেন; কৃষ্ণের পাছে কোনও কষ্ট হয়, এই ভয়ে নন্দরানী সর্বদাই ব্যাকুল। যশোদার এই স্নেহভাবে এমন একটি সরল স্বাভাবিক সৌন্দর্য দেখা যায়, তাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। আমাদের চোখের সম্মুখে সেই আভীর পল্লীর ছায়াসুপ্ত গ্রাম্য ছবি ফুটিয়া উঠে। ... যশোদার স্নেহ বড়ই মধুর। সে স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় হইতে নিঃসৃত।[৫৪]

যশোদা চরিত্রের মূল সন্তান বাৎসল্য। কবিরা তাঁর যৌবন, দৈহিক সৌন্দর্য, পূর্বরাগ, প্রেম প্রভৃতি নারীর নারীত্ব সম্পদের কোনো প্রভাব দেখান নি, সত্য, কিন্তু মাতারূপে তিনি অনন্য। তাঁর সন্তান স্নেহ অগাধ এবং অকপট। প্রাবন্ধিকের মতে —'যশোদার অন্তর নির্বিবাদী, অসূয়াশূন্য, স্নেহগঠিত। কোমলতা তাঁহার প্রকৃতি, স্নেহ তাঁহার প্রাণ।' এই বৈশিষ্ট্যই যশোদা বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল এবং অবিস্মরণীয় জননী চরিত্র।

বলেন্দ্রনাথের প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক একাদশ সংখ্যক প্রবন্ধ ৭টি। 'শিব' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ১২৯৮ বঙ্গাব্দের 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়। দীর্ঘ এই প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ শিব চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর তেজস্বিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—

আদর্শ পুরুষ চরিত্র শিব। প্রেমে, বলে, ক্ষমা, ক্ষমতায়, গার্হস্থ্যে বৈরাগ্যে তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ। সমস্তভাবে তাঁহার প্রেম এবং বল প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমে বলে কোথাও বিযুক্ত হয় নাই। তাই শিবের চরিত্র সৃষ্টি প্রলয়ের সহিত চিরবন্ধনে বদ্ধ। প্রেম হলাহল পান করিয়া প্রলয়কে কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছে, বল বিষে জর্জরিত হইয়াও মৃত্যুকে দমনে রাখিয়াছে। শৈব সাহিত্যে প্রেমে এবং বলে মহত্বের অনুশীলন।[৫৫]

শিবের চরিত্রে শক্তি আছে, কঠোরতা আছে, কিন্তু মত্ততা নেই। শিব পর্বতের মতো অটল এবং সমুদ্রের মতো গভীর। যদিও বাংলা সাহিত্যে শিবের মানবত্বই বেশি। তিনি কখনো যোগী, কখনো গৃহস্থ, আবার কখনো বা গৃহী বৈরাগী। তাঁর উপরে মদনের প্রভাব পড়ে, তাঁরও চিত্ত চঞ্চল হয়, যোগ ভঙ্গ হয়, ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে, শান্তির জন্য নিজেকে সংযত রাখার প্রয়াস পেতে হয়। বাংলা সাহিত্যে শিবের এইরূপ আচরণ তাঁকে মানব চরিত্র করে তুলেছে।

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ক বলেন্দ্রনাথের দ্বাদশ সংখ্যক প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের দেবতা' প্রকাশিত হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'সাধনা'য়। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে দেবতাদের যে পরিচয় আছে, আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁদেরই মনোজ্ঞ এবং যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন প্রাবন্ধিক। তুর্কি বিজয়ের পর সেকালের বাংলাদেশে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে রাজা ও প্রজার সমন্বয় সাধনে যে অরাজকতা, যে মাৎসন্যায় চলেছিল—মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের সঙ্গে সেকালের ভক্তদের সেই একই

রকম সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। দেবতার খামখেয়ালিপনা সেকালের মঙ্গলকাব্যাদির মূল বিষয়। বাংলা সাহিত্যের দেবতাদের সেই স্বভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন,

> যেমন রাজ্যশাসন, দেব শাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসনতন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছেন মাত্র। অপরিণত বুদ্ধি একটা দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাব শাসনের পরিবর্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন; সর্বনাশ ভয়ে দুর্বল ভক্তবৃন্দ চৌত্রিশ অক্ষরে দুর্বোধ ছড়া বাঁধিয়া তাঁহার স্তুতিপাঠ করে। যোড়শোপচারে সেবার বিধান করিয়া দিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে।
>
> দেবতা বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র রাগ-দ্বেষ, ভয়-হিংসা বিবর্জ্জিত নহে। দেবত্ব যাহা কিছু অপরিমিত অত্যাচার ও যথেচ্ছ অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতায় এবং সুবিধা পাইলেই এই দারুণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেও দেবকুলের কখনো ত্রুটি দেখা যায় না। নবাব এবং বাদশাহদেরই মত খামখেয়ালি মেজাজ-ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট — কখন এবং কেন যে কাহার প্রতি সদয় নির্দয় বুঝা ভার। খেয়াল বশতঃ সহসা যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহাকে ধন দেন, রত্ন দেন, নবাবির প্রথানুসারে জায়গীরও দিয়া থাকেন এবং পরের সর্বনাশ সাধন করিয়া উক্ত ভূখণ্ডে প্রজাপত্তনের সুবিধা করিয়া দিতেও ত্রুটি করেন না। যে হতভাগ্য সকারণে অথবা অকারণে একবার ইহাদের কাহারও বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়, তাহার প্রতি তেমনি দুর্জ্জয় কোপ-ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক, তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। অনুগ্রহ নিগ্রহের কারণ প্রায়ই এত সামান্য যে, তাহাতে আমল দেওয়া চলে না এবং সেটুকু কারণও অনেকসময় চঞ্চলমতি দেবতারা বলপূর্ব্বক ঘটাইয়া থাকেন।

বলেন্দ্রনাথের মতে — খামখেয়ালি আচরণ বাংলা সাহিত্যের দেবচরিত্রের প্রধান লক্ষণ। এই খামখেয়ালিপনা কেবল মানুষ বা ভক্তের প্রতি নয়, ছোটো দেবতার প্রতি বড় দেবতার ব্যবহারেও তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিচার এবং বিবেচনা বাংলা সাহিত্যে দেবতাদের কাছে কখনো প্রত্যাশা করা যায় না। বাংলা সাহিত্যে দেবতারা — কেবল একদল খেয়াল পরিচালিত কর্তৃপক্ষ, যার প্রতি অনুকূল হন, তার সাতখুন মাপ আর প্রতিকূল হলে বিনা দোষেও উৎপীড়নে পরান্মুখ নন। প্রাবন্ধিক লিখেছেন—

> বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবতাদের কিছুমাত্র সম্ভ্রম নাই। বিলাসিতা সংস্কৃত স্বর্গেও কম নহে। দেবচরিত্রে এ কলঙ্ক বহুদিনের। অমরাবতীর বড়কর্তাটির অপকীর্তি ত সর্বজনবিদিত। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দেবতাগুলির মত খেলো — অপদার্থ চরিত্র কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় সম্ভ্রান্ত দেবগণ — যেমন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর — বাঙ্গলাদেশে আসিয়া পদমর্যাদা একেবারে

হারাইয়াছেন।... দেবলোকে সবই আছে — নাই শুধু সুগভীর প্রেম, সামান্যতম ত্যাগ স্বীকার, কোনোরূপ উচ্চ আদর্শ।"[৭]

দীর্ঘ এই প্রবন্ধে সুললিত সরল, স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ভাষায় নির্মোহ বিশ্লেষণী ভঙ্গিতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের দেবচরিত্রগুলির প্রকৃতি ও স্বভাবের পরিচয়ই তুলে ধরেছেন। তাঁর এই বক্তব্যে ছোটকাকা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে স্পষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও সেকালের সমালোচনা সাহিত্যে এইরূপ নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা বড় একটা দেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য এবং জনপ্রিয় ও বারেবারে সমালোচিত গ্রন্থগুলি নিয়ে সেই বারটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন তিনি, যা একালেও সমানভাবে সমাদৃত। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে এক ধরনের নির্মোহ বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সাবলীল ও স্বচ্ছ ভাষার ব্যবহার, বিষয় দক্ষতা বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির নিজস্ব এপদে। এই জাতীয় রচনাশৈলীই তাঁকে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সমালোচকের মর্যাদা দান করেছে। মাত্র ২৯ বছর বয়সে বাংলা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে তিনি যে নিজস্বতার পরিচয় রেখে গেছেন, তা আজও স্মরণযোগ্য।

উল্লেখসূত্র :

১. বলেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগতজীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যায় — সাহিত্য সাধক চরিতমালা এবং সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান থেকে।

২. ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট-মাসে প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, উৎসর্গ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ লেখক লিখেছিলেন — "পরমপূজনীয় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাকা মহাশয় শ্রীচরণেষু।" মূলত 'সাধনা' পত্রিকায় চিত্র ও কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তারই কতকগুলি সংশোধিত ও পরিমার্জিত প্রবন্ধের সংকলন এ গ্রন্থ।

৩. ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মূলতঃ কাব্যগ্রন্থ, এতে মোট ২৫টি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলির অনেকগুলি চতুর্দশপদী কবিতা।

৪. ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে এই কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট ২৪টি ছোটো ছোটো কবিতার সংকলন এই গ্রন্থটি। কলসীর সুখ, চুলবাঁধা, সন্তরণ, বধূ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত কবিতা এই কাব্যগ্রন্থের মূল সম্পদ।

৫. একরাত্রি, চন্দ্রপুরের হাটে, বনপ্রান্ত, পুলের ধারে প্রভৃতি প্রবন্ধ 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৬. 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক অধিকাংশ লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস, বঙ্গসাহিত্য ঃ রামপ্রসাদের গান, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র রায়, কেতকা-ক্ষেমানন্দ, শিব প্রভৃতি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

৭. 'ভারতী' পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি লেখাই প্রকাশিত হয়েছিলো। এদের মধ্যে কলবেদনা, দিল্লীর চিত্রশালিকা, বেণোজল, প্রাচ্য প্রসাধনকলা, গৃহকোণ প্রভৃতি লেখা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮. 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় যেমন বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনা মূলক একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি 'সাধনা' পত্রিকায়ও তাঁর বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। 'ঋতুসংহার', 'বুদ্ধদেব', মালবিকাগ্নিমিত্রম্' , 'বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবতা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির কথা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

৯. 'সাহিত্য' পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবি ও সেন্টিমেন্টাল', 'প্রাকৃটিক্যাল' প্রভৃতি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত।

১০. 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। 'সৌরভ', 'দুজনায়', 'বিদায়' নাম্নী কবিতাগুলি তাদের মধ্যে বেশ উল্লেখযোগ্য।

১১. ঠাকুরবাড়ীর নিজস্ব পত্রিকা 'পুণ্য'তে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা 'টা ও খান', সুরাদেবী নামের কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

১২. রবিবর্ম্মা, লাহোরের বর্ণনা, শিবসুন্দর প্রভৃতি প্রবন্ধ 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩. ২০ আগস্ট ১৮৯৯ মাত্র ২৯ বছর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে এই প্রতিভাবান সাহিত্যিক প্রয়াত হন।

১৪. ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

১৫. বলেন্দ্রনাথের মতো আমরাও স্বীকার করি বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের কালপর্ব ইংরেজি প্রভাবের পূর্ব পর্যন্তই ধর্তব্য;যাকে আমরা প্রাগ্ ইংরেজ বাংলা সাহিত্যও বলতে পারি।

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা-১৭৩।

১৭. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৭২ দ্রষ্টব্য।

১৮. ১২৯৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধটি।

১৯. আমরা পূর্বেই স্বীকার করেছি বাংলা সাহিত্যের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ চর্যাগীতিকোষবৃত্তি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে বাংলা সাহিত্যের আদিতম কবি হিসাবে এদেরই উল্লেখ করেছেন বলেন্দ্রনাথ।

২০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০১০, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা-১৮০-১৮১।

২১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৮৩।

২২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৮৭।

২৩. ভারতী ও বালক; ভাদ্র ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

২৪. কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' (বান্ধব, মাঘ ১২৮১) এবং সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালী কবি কেন' (বঙ্গদর্শন : পৌষ ১২৮২) প্রবন্ধদুটির সমালোচনার সূত্রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভারতী-পত্রিকায় পরপর দুটি প্রবন্ধ লেখেন (ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত)। 'বাঙ্গালী কবি নয়' এবং 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' — এই দুই প্রবন্ধেই মুকুন্দের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আলোচ্য প্রবন্ধে মুকুন্দের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

২৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বলেন্দ্র—গ্রন্থাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০১০, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা—১৯২।

২৬. বান্ধব, মাঘ ১২৮১, নীরব কবি প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাঙালি কবির স্বভাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন, যেখানে 'নীরব কবির' তত্ত্বটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

২৭. বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২, বাঙ্গালী কবি কেন প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— 'বাঙ্গালীর কল্পনাও প্রবল, সুতরাং 'বাঙ্গালী কবি'—রবীন্দ্রনাথ এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন।

২৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ মোহিনীমোহন সরদার প্রণীত কবিকঙ্কণ চণ্ডী ঃ বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান, কোডেক্স, ২০১০, বিরোধ-বিতর্কের ঘূর্ণাবর্ত ঃ মুকুন্দ সমালোচনার অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ২৭৬-২৮১।

২৯. দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা ১৯২।

৩০. দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃষ্ঠা-১৯৭।

৩১. দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র , পৃষ্ঠা-১৯৮।

৩২. অগ্রহায়ণ, ১২৯৩, তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম সংখ্যা।

৩৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ নবজীবন, তৃতীয় ভাগ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-১২৯৩, পৃষ্ঠা-৩১৫।

৩৪. চৈত্র ১২৯৩।

৩৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ সাহিত্য, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-১৭২।

৩৬. কার্তিক সংখ্যা ১২৯৬।

৩৭. দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বলেন্দ্র — গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, কৃত্তিবাস ও কাশীদাস (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা-২২৬।

৩৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃষ্ঠা-২৩০।

৩৯. প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ ১২৯৬ এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় পৌষ ১২৯৬।

৪০. ফাল্গুন ১২৯৬।

৪১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, ভারতচন্দ্র রায় (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা-২৭১।
৪২. দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃষ্ঠা-২৭৮।
৪৩. ফাল্গুন, ১২৯৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।
৪৪. বলেন্দ্রনাথের মতে কেতকা এবং ক্ষেমানন্দ এঁরা পৃথক ব্যক্তি। তাঁর মতে—মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডী রচনার কিছুকাল পরেই এই দুইজন কবি 'মনসার ভাসান' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।
৪৫. দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, কেতকা-ক্ষেমানন্দ (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা-২৮৪।
৪৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃষ্ঠা-২৮৪।
৪৭. দীনেশচন্দ্র সেনের মতে—কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ দুজন পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা মিলিতভাবে মনসার ভাসান রচনা করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথ এই তথ্য থেকেই সম্ভবতঃ এরূপ মন্তব্য করেছেন।
৪৮. দীনেশচন্দ্র সেন পরে স্বীকার করেছিলেন—'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এক কবিরই নাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।" বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৪১১।
৪৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, কেতকা — ক্ষেমানন্দ (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা-২৮৮-২৮৯।
৫০. শ্রাবণ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ভারতী ও বালক পত্রিকা।
৫১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, রাধা (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা-৩১৬।
৫২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, কামিনী—প্রকাশালয়, ২০০২, পলাতকা (কাব্যগ্রন্থ), মুক্তি (কবিতা), পৃষ্ঠা—৪৮১।
৫৩. অগ্রহায়ণ ১২৯৭।
৫৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১০, যশোদা (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা-৩৩৯-৩৪০।
৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, শিব প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা-৩৭৯।
৫৬. দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র, বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবতা (প্রবন্ধ), পৃষ্ঠা -৪৬২-৪৬৩।
৫৭. দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে দেবতা (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা৪৭০-৪৭১